প্রকাশক : রমা বন্দ্যোপাধ্যায়
শশধর প্রকাশনী
১৯এ, কেদার বসু লেন
ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০০২৫

প্রথম প্রকাশ : ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯

গ্রন্থ পরিকল্পনা : অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শুভাপ্রসন্ন

অলংকরণ : চিত্ত দাস

প্রাপ্তিস্থান : কলেজ স্ট্রীট ও অন্যান্য স্থানের সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়।

মুদ্রণ অমল বন্দ্যোপাধ্যায়
মৌ প্রেস
১৯এ, কেদার বসু লেন
ভবানীপুর
কলকাতা ৭০০০২৫

বাঁধাই ব্লু বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস,

উৎসর্গ

শ্রীমতী নিভাননী দেবী

শ্রীমতী বিভাবতী দেবী

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রস্তুতি প্রসঙ্গে

'খুঁত' নামে একটি কবিতায় প্রেমেন্দ্র মিত্র জানিয়েছেন, 'নিরেট সত্য নিখুঁত মাধুরী ছাপানোই পাবে কিনতে'। হাতের লেখায় 'কিছু ভুল কিছু কাটাকাটি নিয়ে' যে ব্যক্তি-পরিচয়, ছাপার হরফের 'নিখুঁত মাধুরী'তে তা হারিয়ে যায়। 'ছাপার অক্ষরে ব্যক্তিগত সংস্রবটি নষ্ট হয়—সে অবস্থায় এইসব লেখা বাতি-নেবা চীন লণ্ঠনের মতো হাল্কা ও ব্যর্থ হতে পারে।'—এ আশংকা প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথও।

১৯২৬ সালে কবিগুরু 'লেখন' ছাপিয়েছিলেন জর্মনিতে। এখন আমাদের দেশেই হাতের লেখা ছাপানো সম্ভব। বলা যায়, প্রিয় কবিদের কাছে পাওয়ার এ এক দুর্লভ সুযোগ। কবিকণ্ঠে কবিতা শোনার মতো কবির পাণ্ডুলিপি পাঠও একটি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

সামনে বইমেলা। নতুন বইয়ের পরিকল্পনা তাই সহজেই বাতাসে ছড়াচ্ছে। এই আবহাওয়ায় বন্ধু অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান বইটির পরিকল্পনা পেশ করলেন। তাঁর কথা মান্য করে কাজে নামলাম। এত অল্প সময়ে বইটির রূপায়ণ তবু যে সম্ভব হল তার একটিই কারণ—প্রবীণ কবিদের নবীনতা। যত দ্রুত সম্ভব আমার প্রার্থিত কবিতাগুলি তাঁরা লিখে দিলেন। স্মরণীয় কবিতার সংকলনে এ অভিজ্ঞতাও আমার কাছে কিছু কম স্মরণীয় নয়।

দূর-প্রবাসী কবি অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ সম্ভব নয় বলে তাঁকে এ সংকলনে উপস্থিত করতে পারি নি। প্রস্তুতির দ্রুততায় আরও কয়েকজন প্রবীণ কবির কাছে যেতে পারি নি। এ সবই অপূর্ণতা। 'মর্ত্যের মাটিতে যে কোন বৃত্তই অসম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ বৃত্ত শুধু আকাশেই সম্ভব।' অতএব আমার এই অসম্পূর্ণ কাজটিও পাঠকের হাতে তুলে দিলে ক্ষতি কী?

একটি পুণ্যদিনে বইটির প্রকাশ ঘটছে। বাংলাভাষাকে ভালোবেসে যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন, একুশে ফেব্রুয়ারির সেই অমর শহীদদের স্মরণ করি, প্রণাম করি।

রমাপ্রসাদ দে
পম্পা, মিজানগর
সরকারী আবাসন

কবি তব মনোভূমি রামের জনম স্থান
অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৯০৪

অরুণ মিত্র ১৯০৯

দিনেশ দাস ১৯১৩

সমর সেন ১৯১৬

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯১৯

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯২০

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ১৯২০

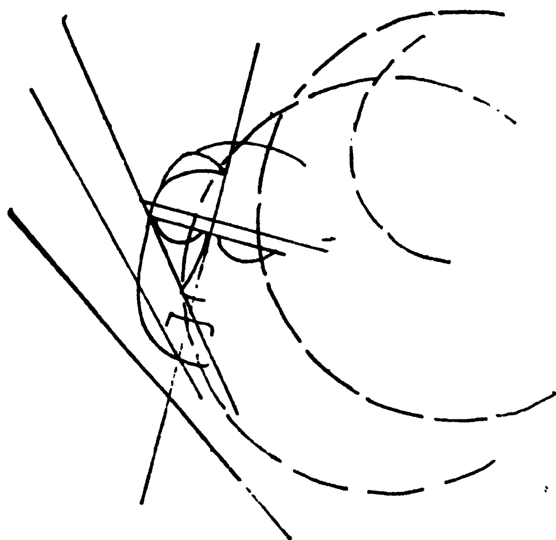
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৯২৪

প্রেমেন্দ্র মিত্র



আধুনিক কবিতার পুরোভাগে যাঁরা, প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁদের অন্যতম। তাঁর মন অসুখী ও জটিল হলেও তিনি অস্বাস্থ্যকর জটিলতাকে প্রশ্রয় দেন নি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা বাইরের দিক থেকে সহজ ও সরল, কিন্তু ভেতরে গভীর সুদূরতার দিকে মনকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। যথার্থ কবিমনের অধিকারী তিনি; এবং সেই মনকে অল্প কয়েকটি কথায় প্রকাশের ক্ষমতাও তাঁর অসামান্য। তাঁর রচনায় বহিরঙ্গ আতিশয্য নেই, শৈলীতে দুষ্ট মুদ্রা নেই। তাঁর বর্ণনা সুমিত ও ব্যঞ্জনাময়। তাঁর কবিতায় প্রথমেই নজরে পড়ে মুক্তমনের প্রতিফলন; সেই মন সংস্কারবিহীন কিন্তু সংস্কৃত। এ-যুগেরই মানুষ তিনি। যুগের জটিলতা, যুগের নিরাশার হাত ধরেই তাঁকে জীবনে পথ হাঁটতে হয়েছে। কিন্তু যে-কাব্যপ্রাণতা জটিলতাকে সরল করে তোলে, নিরাশার বুকেও আশার প্রদীপটি জ্বালিয়ে দেয়, তার চাবিকাঠির খোঁজ তিনি অনায়াসেই পেয়েছেন।

বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়



পরিশিষ্ট [illegible]—

এ মাটির ঢেলা কবে কে ছুঁড়িল
সূর্যের পানে তাই
পৃথিবী যাহার নাম?
লক্ষ্যভ্রষ্ট চিরদিন ধরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফেরে
সূর্যের অবিরাম,
তারই সন্ততি আমাদের ও তাই
ব্যর্থ যে সন্ধান,
লক্ষ্য নিরুদ্দেশ তুলি;
কোথায় সকল স্বপনের সাধ গাঁথিয়া কেমন করি
লেগেছে মলিন ধূলি।

মাটি ও পাথর কাটি' আর খুঁদি'
দেবতা গড়িনু ঢের
মাগিলাম কল্যাণ;
বেদীমূলে তার তবু শোণিতের দাগ লেগে আছে
— দেবতার অপমান।

কত জীবনের কত সমারোহ · সাথী লইয়া মোর
যে আলো জ্বালায়ে তুলি;
দেখি তার জ্যোতি বিফলে মিলায়,
নাচে শুধু ভয়াবহ
সর্পিল শিখাগুলি।
যাদের বন্ধনে বাঁধিব যাহারে,
তাহারে সবাই কাড়ে,
— সে মোর আপন নয়!
জীবন যাহারে ঘিরি' উচ্ছলে,
তারা সূর্যের আলো
দুই হাতে আগলায়।
অন্ধলোকের খুলেছি দ্বার,
সূর্যোদয়ের বাণী,
শুনিয়াছি ভালোবাসা;
তবু হিংসার অন্ধ কারায় সভয়ে লালন করি,
শুধু বাঁচিবার আশা!

পাষাণ্ড দেবতা মোদের নয়নে অশ্রুজ্যোতি,
হিংস্র নখর-হাতে;
জানি তার নারী-সর্বনাশিনী
তবুও চলিতে হবে
তার ইঙ্গিত ইশারাতে,

সভ্য-ধ্বংসী পৃথিবীর-তো সে আদিম অভিশাপ
বহি মোরা চিরদিন;
আবেশের আলো যত করি না
মিটিবে না কভু তা
এ আদি পাপের ক্ষয়

সাপ

প্রথম সাপটা দেখার নিথর পাথর সম্মোহিত
কোন সে আদিম অন্ধ অঘোর
অন্বেষণের দ্বিধা।
আঁধার জমানো ছায়া বিদ্যুৎ
জেনে খোলে কুণ্ডলী!

তারপর সাপ অনেক দেখবে
ফোঁসে ওঠা শর-বন।
কাঁটা দেওয়া-ত্রাস সভয়ে শুনবে
গোপন সঞ্চরণ।
— শোনা-না-শোনার সীমানায় শুধু
শুভ্রতা শিহরিত।

সব শেষে এক আহ্লাদী সকাল
~~সকলে~~ গহন অতল থেকে,
হিমেল হিংসা ছেঁকে নিয়ে এসে
রোদ্দুরে মেলবে কি?
ছড়ে মেলাবে, ধূলা-জড়িম বিবরের
সরীসৃপের বিষ ফণা আর
পাখিদের নীল ঘুড়ি!

অরুণ মিত্র



অরুণ মিত্রের কবিতা আপাত-সহজের আড়ালে আমাদের এক কঠিন বিপন্ন সময়ের আর তা থেকে উৎরে জীবনের স্বতোৎসারিত এক নির্ঝরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। যে-পাথরে এই নির্ঝরের মুখ, সে কিন্তু শক্ত নিখাদ পাথরই। এক প্রচ্ছন্ন অথচ খর দ্যুতিতে তাঁর কবিতা অনেক কিছুই তখন আমাদের দেখে জেনে নিতে বলে। আর এই কবি এক প্রগাঢ় মমতায় আমাদের সেই ধরা-ছোঁয়ার জগতটিতে পেঁাছে দিয়ে যান। আধুনিক বাংলা কবিতায় এইখানে তাঁর জুড়ি নেই। এই যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা, বিশেষ করে স্পর্শগ্রাহ্যতা। মাপা-বাঁধা ছন্দের বাঁধনটি শেষ পর্যন্ত তিনি খুলে দেন, চলে আসেন গদ্যছন্দের আটপৌরে ঘরোয়া এক বিন্যাসে, অন্তরঙ্গ কথকতার মধ্য দিয়ে তিনি কবিতার এক আশ্চর্য রূপবদল ঘটিয়ে দেন, "মুখের ভাষা যে ফুলের মতো জীবন্ত হতে পারে তা তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস হয়।"

অরুণ মিত্র

একটি শিখাও আর

একটি শিখাও আর প্রতিবিম্ব ফেলে না
ভরা অঘ্রানের বিকেলে নিবে গেছে,
শরীর আর বৃক্ষ আর পাথরের আগুন
পৃথিবীর জঠরে ফিরেছে,
পশ্চিমের দীর্ঘিতে হাওয়া মরে
শীতল বৃত্ত পাথরে বৃক্ষে শরীরে।

কিছুই আলোকিত নয়, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা
অনেক শাখার কঠিন অন্ধকারের
অপরিচয় থেকে আপন হওয়ার মতো;
শিকড় যতদূর থেকে রস টানে
ততদূর বৃক্ষের ব্যাপ্তি ছড়ানো,
নীরব আর অপলকনেত্র
শুধু দুই চোখ বিস্ময়ের আকাশ।

পশ্চিমের দীর্ঘিতে মরা পাতা
বিস্মৃতির হাওয়ার বৃত্ত,
সময়ের এইখানে অবগাহনের কেন্দ্র
গাঢ় থেকে গাঢ়তর নিমজ্জন।
কিন্তু একটি অনির্বচনীয় ধ্বনির জন্যে
হেমন্তের দৃশ্য নিস্তব্ধ...
আমি প্রতীক্ষায় রয়েছি, অন্তিম হৃদয়।

মূর্তি দালান মুখ

শহরের খবরই বলবার ছিল। পাথরগুলো ফাটছে। এত বছরের ঝড়জলরোদ-খাওয়া পাথর। একের পর এক খোদাই-করা অক্ষরের ভাঙচুরে যেন অন্য এক ভাষার ছাঁচ। মূর্তি এবং দালানের গোড়ায় অসম্ভব তাদের কথাই আমি বলতে চাইছিলাম। কিন্তু আমাকে চুপ করে থাকতে হল। আমার একান্ত কাছের মুখগুলো বরফের মতো গলে যাচ্ছে দেখলাম।

গর্জনের সামনে

গর্জনের সামনে একটা তারা কাঁপছে। তাকে দেখার পরই আমরা বেরিয়েছিলাম, বুলা আর আমি। একমনে হাঁটছিলাম। আমরা সারা পথ নানান কথা বলছিলাম। মানুষ, চড়ুই, টগর, দল, কাঠবিড়াল, আমরা আর ঐ তারা। সবটাই তো আমাদের ভালোলাগা। আমরা বুঝেছি আমাদের যে-বুদ্ধি আছে তা দিয়ে কোনো হিসেব মেলানো যায় না। আমরা তাই এইভাবেই বলি। তোমার সঙ্গে চলতে আমার ভালো লাগে, তোমার সঙ্গে দেখতে আমার ভালো লাগে, তোমার সঙ্গে ভাবতে আমার ভালো লাগে।

তারাটা যখন সবে ফুটেছে তখন আমরা বেরিয়েছিলাম। আমরা কোনো কিছু থেকেই আলাদা হয়ে যাইনি। এই দিন এবং এর আগের সবগুলো দিন এবং সবগুলো সন্ধে আর রাত আমরা আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিলাম। আমরা কথা বলছিলাম। কথাগুলো যেন জুড়ে জুড়ে এক সাঁকো, তার উপর দিয়ে আমাদের সমস্ত ইচ্ছে সমস্ত বোঝাবুঝি পারাপার করছিল। কষ্ট কি ছিল না? ভীষণভাবেই ছিল। খাবারের দোকানের কাছে ভিখিরি ছেলেটা কোনোদিন আমাদের নজর এড়ায়নি। এবং ঘরে বাইরে যত যাচ্ছেতাই চিৎকার আমরা শুনেছি, সব আমাদের কানে লেগে ছিল। তবু আমরা ওদের ছাপিয়ে উঠছিলাম। এই সমস্তকে ঘুরিয়ে-নেওয়া আর একটা সময়ের কথা আমরা ভাবছিলাম, বলছিলাম। আমাদের বলা এবং শোনা অনেক কবিতার বাজনা আমাদের উছলে তুলছিল।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে কতদূর এসেছি? যতদূরই হোক, ফিরবার ভাবনা আমাদের মাথায় নেই। কিন্তু ঐ তারা এখন কাঁপছে। আমি বুলার হাত শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়েছি। আমরাও গর্জনের সামনে।

দুপুরের সূর্য

দুপুরের সূর্য গুঁড়িয়ে গেল আর আমি অনুভব করলাম
তোমার স্পন্দন থমথমে রাতের মতো
তোমার শুকনো মুখ শস্যের শিকড়ে শিকড়ে হাওয়া
অনুভব করলাম।

দৃশ্য

নিখোঁজ ছেলেটা আবার ওই তো দাঁড়িয়ে ঢালু পাড়ে পিছনে যাওয়ার মতো তার যা কিছু দেখা সর্বাঙ্গে ফুটে বীভৎস পাঁচু বানানো আর এপার সবুজ বাস্তুকে ঘেরাও নারকেল গাছের মাথায় ঘাসের চাপড়ায় ধানক্ষেতে ঝিঙে ধুঁধুলের মাচায় আরো কত কত আকার বারান্দার টবে বাগিচায়। আর কোল ছেড়ে বাজারে বাজারে দুনিয়া ঘুরে উদোম ছেলে ফের এসে পড়েছে বুকের ওপর। তার হাত দুটো সবই সাপটে ধরতে গিয়েছিল কিন্তু খুদে আঙুলগুলোর ফাঁক দিয়ে গলগল করে, যেন রক্ত, বেরিয়ে গিয়েছিল চালডাল আনাজ সবই। মাটি বড় স্নেহময়ী চারদিকে ছবির ফুল ফুটিয়ে ছবির ফল ফলিয়ে ওকে সাজিয়েছে মাঝখানে সে আহামরি কী শিল্পময় হয়ে আছে।

নিসর্গের বুকে

আমি গত বয়েসে গাছকে বলছি
তোমার ভাঙা ডালে সূর্য বসাও
হা: হা: আমি গাছকে বলছি
অন্ধকার হয়েছে আর আমি নদীকে বলছি
তোমার মরা খাতে পরী নাচাও
হা: হা: আমি নদীকে বলছি
খরায় মাটি ফেটে পড়ছে
আর আমি হাঁটছি রক্ত পায়ে
যদি দুয়েকটা বীজ ভিজে ওঠে
হা: হা: যদি দুয়েকটা –
নিসর্গের বুকে আমি হাড় বাজাচ্ছি
আর মাদারির মতো হেঁকে বলছি
এই অশ্রুপাত হয়ে যাবে একমাত্র ধান
ঝিঁঝি হুতোম প্যাঁচা শেয়াল
অশরীরী আর অপ্সরায় রাত বুনছে
আমি বলছি একমাত্র ধান…
হা: হা: হা: হা:

এই শব্দ চিনিয়েছিল

আমাকে এত
সময় রক্তস্রোতে অরণ্যের পথ
ইস্পাতে ফলায় খুললো মাটি আর মৃত্যু
কিন্তু ও আমাকে দেখায় নি ছায়াবীথি
চিকন জলে মুখ দেখবার আয়না।
ও নিশ্চয় জানত একলা কোথাও ওর যাবার নেই
আমারও নেই,
ও নিশ্চয় জানত সময় দাগা রয়েছে ওর মুখে
আমারও মুখে,
একলা নয় একলা নয়,
তাই বুঝি অগুনতি মানুষের মধ্যে ও মিলিয়ে গেল
তারপর আমি শুনেছি এখনো শুনছি
বিস্ফোরণ তারস্বর উড়াল গান,
আমি অগুনতি মানুষের সঙ্গে ঘুরছি
আর চব্বিশ ঘন্টার তাপ আমার গায়ে লাগছে
আমার কাম্মিলার তাপ।

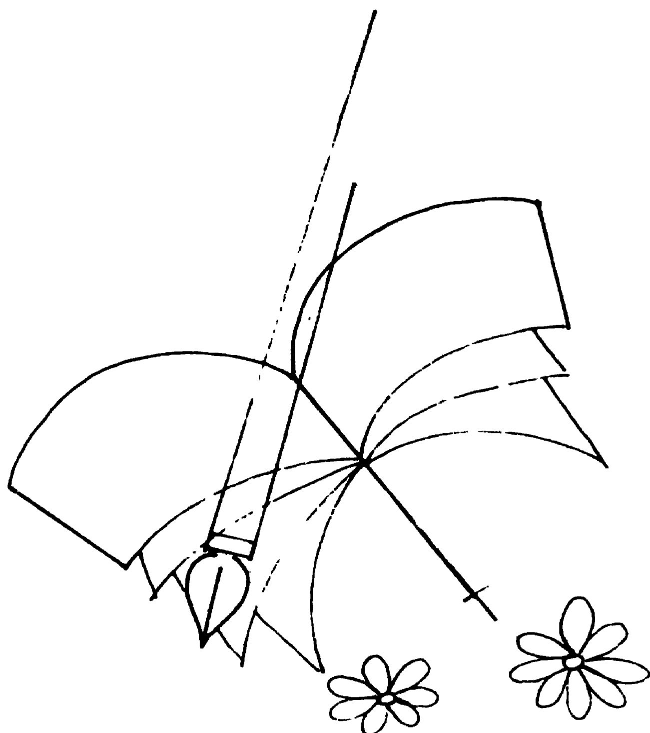
দিনেশ দাস



একটি লেখা ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমহলে হৈ চৈ পড়ে যাওয়ার ঘটনা সাহিত্যে কদাচিত ঘটে। তিরিশের শেষাশেষি আর চল্লিশের গোড়ার দিকে এ জিনিস আমরা দুবার ঘটতে দেখেছি। প্রথম, দিনেশ দাসের 'কাস্তে' কবিতা। দ্বিতীয়, সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্প। নজরুলের 'বিদ্রোহী'তে বোধ হয় ছিল আরও বড় রকমের চমক। তবে সে আমাদের জ্ঞানে নয়। কেন কিভাবে এ জিনিস ঘটে বলা শক্ত। তবে এই তিনেরই এক জায়গায় মিল আছে। সে মিল হল তখনকার সমাজ-মানস। ভেতরে ভেতরে যা গুমরে উঠছিল, ভাষা দিয়ে তাকে বাইরে এনে দেওয়া। সবাক ছবি ফোটানো। এমন ছবি যা প্রতীকের তাৎপর্য পাবে। দিনেশ দাসের 'আকাশের চাঁদ হল কাস্তে' তাই শুধু স্মরণীয় একটি লাইন হয়েই থাকে নি। রাতারাতি একটি প্রবাদে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আর কবিতায় তাঁকে শিরোপা দিয়েছিলেন একই সঙ্গে দুই জ্যেষ্ঠ কবি—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আর বিষ্ণু দে।—চার পাশে যা ঘটছে, ঘর আর বাইরের টানাপোড়েন, ভালোমন্দের দ্বন্দ্ব, জীবন আর মৃত্যু—দিনেশ দাসের কবিতায় সবই আছে। সেই সঙ্গে আছে বেদনাবিধুর সেই মন যার হাতে ধুলোমুঠো সোনামুঠো হয়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

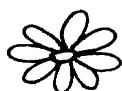
আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯৮৫

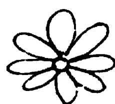


কাব্যচিন্তা

দিনেশ দাস

তাঁতীরা যেমন ক'রে গুটিপোকা থেকে
সোনালী রেশমী সুতো কাটে পর পর,
কবিও তেমনি বোনে শব্দের গুটি থেকে
কবিতার রেশমী কাপড়।





কাস্তে

দিনেশ দাস

বেয়নেট হ'ক যত ধারালো
কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু,
শেল আর বোম হ'ক ভারালো
কাস্তেটা শান দিও বন্ধু!

বাঁকানো চাঁদের সাদা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে?
চাঁদের শতক আজ নহে তো,
এ-যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে!

লোহা তার ইস্পাতে দুনিয়া
যারা কাল করেছিল পূর্ণ,
কামানে কামানে ঠোকাঠুকিতে
নিজেরাই চূর্ণ-বিচূর্ণ।

চূর্ণ এ লৌহের পৃথিবী
তোমাদের রক্ত-সমুদ্রে
গলিত গলিত হয় মাটিতে,
মাটির — মাটির যুগ ঊর্দ্ধে।

দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায়ে
আসে ওই, চেয়ে দেখ বন্ধু!
কাস্তেটা রেখেছ কি শানায়ে —
এ-মাটির কাস্তেটা বন্ধু!

জার্নাল : হাসপাতালে

দিনেশ দাস

পি.জি. হাসপাতালের নীল্‌চে কাচের ওপর
আমার হৃৎপিণ্ডের আলো ছায়ার চেকার:
আমার অশান্ত হৃদয়ের সাথে সত্তর বছরে এই
হঠাৎ মুখোমুখি দেখা।
ওর দু'পাশে উঁচো উঁচো তুষারের চাপ
দুটি যমজ-যেন তুষার-কবি গোবিন্দ দাসের
দুটি প্রিয়তমার মত কবি-হৃদয়কে ঘিরে রেখেছে।

গত বছর স্বাস্থ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধায় কেবিনে শুয়ে
ডাক্তার সি.সি. করের নির্দেশে নিষ্ঠার সাথে
অনেক ওষুধের বড়ি গিলেছিলাম
এক একটি মন্ত্রের ক্যাপসুলের মত:
তখন দু'একটা ধমনীর রক্তস্রোত হঠাৎ জট পাকিয়ে
হৃৎপিণ্ডের পাশে উপনদীর মত পথ খুঁড়ি-কাটছিল,
বুকের মধ্যে এক অদ্ভুত যন্ত্রণা —
তবু 'হার্ট-অ্যাটাক" মানব-জীবনে এক আশ্চর্য ঘটনা।

এবার কিন্তু যমজ দুটির ওপর স্নেহের তুষার
বরফের মত কঠিন হয়ে জেগে রয়েছে:
নিকেল-টিন কাচের পর্দায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি,
আমার হৃদয় থরথর ক'রে কাঁপছে
দুটি প্রিয়তমার নিবিড় কঠোর আলিঙ্গনে।

টি.ভি.-র পাশে স্পষ্ট দেখছি,
আমার হৃৎপিণ্ডের রং কালচে জোয়ারের রুটির মত,
এটা এত কালো হল কী ক'রে ডাক্তার সতীশ রায়?
সার্জেন হলেও তিনি কবিপ্রাণ, বললেন
"পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি' — একি কবি ভুলে গেলেন?
বললুম, " সুকান্তর অনেক আগেই যে আমি
নতুন রূপালি চাঁদকে, খণ্ডিত ঈদের চাঁদকে,
লোহার কাস্তের হাতিয়ার ক'রে শানিয়ে এনেছি
পঁয়তাল্লিশ বছর আগে।

হৃৎপিণ্ডকে ভেবেছিলুম একটি টিনটিনে আইসক্রিমের বাটি,
এখন দেখছি, একটা আঠামাখা কালো মিশের ঘটি,
এই-কি আমার পুরানো হৃদয়
যে রাতের প্রহর মত একা একা গান গায়।

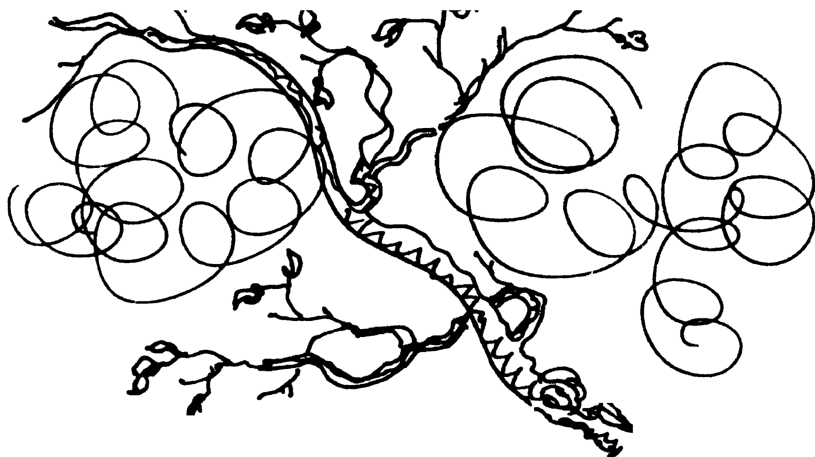
ডাক্তার যোশীর বললেন, সহকারী ডাক্তার সেন ও,
"ভাল আছেন? বুকের খুসখুসি-নেই তো?"
"না-না, ভাল আছি সকালের সেবাযত্নে,
ডঃ যোশীরসাহেব, আমার বেচারী হৃৎপিণ্ডকে
এবার ছুটি দিন। বেচারী জন্মাবধি দিনরাত রাতদিন
ষাট-সেকেন্ডে সত্তরবার ধুকধুক ক'রে চলেছে আজো।
ষাট- বছর চাকরীর পর সকলেই ছুটি পায়
মাস্টারমশাইরা 'রিটায়ার' করেন পঁয়ষট্টিতে,
আর কেন? আমার পুরানো হৃৎপিণ্ডকে এবার ছুটি দিন।
সিস্টার-অধিনায়িকা কুমারী গুপ্তা বড় ও অজস্র খুশি মনের
চোখে হাসির ঝিলিক, ঠোঁটে কৌতুক বাঁকা।
"কী হবে ডাক্তার বাঁধা-ধরা হৃৎযন্ত্র নিয়ে
যার নাম 'পেস-মেকার'?
পেস-মেকার বসালে হয়তো আমি চন্দনার জাহাজে
গ্রহের সীমানায় পৌঁছোতে পারতুম একদিন —
হয়তো শ্রীমঙ্গলময় যোগের মাত্রাধিক জানাতে পারতুম
এই আকাশ অনন্ত না সান্ত, অসীম না সসীম;
আইনস্টাইনের ভাষায়, পজিটিভ, না নেগেটিভ
আকাশের বক্রতায়, প্যারাবোলা না হাইপারবোলা?
আইনস্টাইন নিরুত্তর, সাজ্জন বন্ধুও।
কারণ এই প্রশ্নের সদুত্তর কে মাপবে?
এই-নীল আকাশ, এই সসাগরা পৃথিবী
এই- ভূর্ভুবঃ স্বঃ কি সীমাহীন?
হে সবিতা, হে ভগবান! আমাকে শেষ দীক্ষা দাও!

—

সমর সেন



সমর সেনের কবিতায় বিদ্রোহের ভাব ও ভঙ্গি সুস্পষ্ট। তাঁর কবিতা গদ্যে রচিত, এবং কেবলই গদ্যে। আমার ধারণা ছিলো পদ্যরচনায় ভালো দখল থাকলে তবেই গদ্যকবিতায় স্বাচ্ছন্দ্য আসে, কিন্তু সমর সেনের মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখলুম। তিনি গদ্যে ছাড়া লেখেননি, এবং কখনো লিখবেন এমন আশাও আমার নেই। এখানে এটা বিশেষ ক'রে উল্লেখ্য যে তাঁর গদ্য-ছন্দ বাংলা ভাষায় অভিনব, রবীন্দ্রনাথের বা অন্য কোন কবির ছাঁচে ঢালাই করা নয়। ... নাগরিক জীবন আমরা আরম্ভ করেছি অনেকদিন; কিন্তু আমাদের কাব্যে এ-পর্যন্ত বেশির ভাগই পাওয়া গেছে রাখাল-বালকের চোখে পল্লীপ্রকৃতির ছবি। নাগরিক জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবি বা উল্লেখ কোনো কোনো আধুনিক কবিতে থাকলেও, সমগ্রভাবে আধুনিক নগর-জীবন সমর সেনের কবিতাতেই ধরা পড়লো। সমর সেন শহরের কবি, কলকাতার কবি, আমাদের আজকালকার জীবনের সমস্ত বিকার, বিক্ষোভ ও ক্লান্তির কবি। ঠিক যেন শহরের সুরটি ধরা পড়েছে তাঁর ছন্দে।



দুঃস্বপ্ন

সমর সেন

মাঝে মাঝে তোমার চোখে দেখেছি
আকাশের বিষণ্ণ দুঃস্বপ্ন;
তবু অস্পষ্ট অন্ধকার প্রেত মুহূর্ত
আমার রক্তে হানা দেয়;
তোমার জীবনে আমার সেই দুঃস্বপ্ন
এনেছে পারহীন অন্ধকার।

মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায়
মধ্যরাত্রে।
বাইরে এসে দেখি
তারায় ছেয়েছে বর্ণহীন আকাশ
আর হাওয়া দিয়েছে বিপুল শূন্যতার স্বাদ;
সে হাওয়ায় শুধু মেঘ ভাসে,
আর কেউ ভাসে না.
কোন সুদূর দিগন্তের কান্না;
সে-কান্না যেন আমার ক্লান্তি

এবং তোমার লেখা নিয়ে অনুবাদ।

অনুবাদের মাঝে এখন তোমার উচ্চারণ,
তোমার উচ্চারণ অনুবাদের মাঝে এখন।

বিস্মৃতি

মমা সেন

ভুলে-যাওয়া গন্ধের মতো
কখনো তোমাকে মনে পড়ে।
হাওয়ার মনকে কখনো আসে কৃষ্ণচূড়ার উদ্ধত আওয়াজ।
এবং মেঘের কাছে চেয়ে
সকালের দীর্ঘশ্বাস লাগে।
বন্ধুর রক্তে চোখ রক্তিম হল,
বই আর পৃথিবীর মুহূর্ত এল,
দৃষ্টির আগে শব্দহীন গানে যে ক্ষত, সুদূর মুহূর্তে আসে।

একটি বেকার প্রেমিক

সমর সেন

চোরাবাজারে দিনের পর দিন ঘুরি।

সকালে কলতলায়
ক্লান্ত গণিকারা কোলাহল করে,
খিদিরপুর ডকে রাত্রে জাহাজের শব্দ শুনি;
মাঝে মাঝে ক্লান্তভাবে কি যেন ভাবি—
হে প্রেমের দেবতা, ঘুম যে আসেনা, সিগারেট টানি;
আর শহরের রাস্তায় কখনো বা প্রাণপণে দেখি
ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক।
আর মদির মধ্যরাত্রে মাঝে মাঝে বলি:
মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও,
পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো
হানো ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন।
কলতলায় ক্লান্ত কোলাহলে
সকালে ঘুম ভাঙে
আর সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে
বণিকসভ্যতার শূন্য মরুভূমি।

স্মৃতি

সমর সেন

আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে।
উর্বশী,, কত রাত আর হবে এমনি,
আর হবে এমনি
মধুর কত মুহূর্তের নীল আকাশ;
স্মৃতির দিগন্ত বেয়ে এল রাত্রির অন্ধকার,
আর এলোমেলো,
তুমি ভোরের হাওয়া এলে ধূসর পথ বেয়ে;
উর্বশী, কত রাত আর হবে এমনি, কত মুহূর্ত,
শূন্য হবে এল অগণিত কত প্রহরের ক্লান্তি,
তবু আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে।

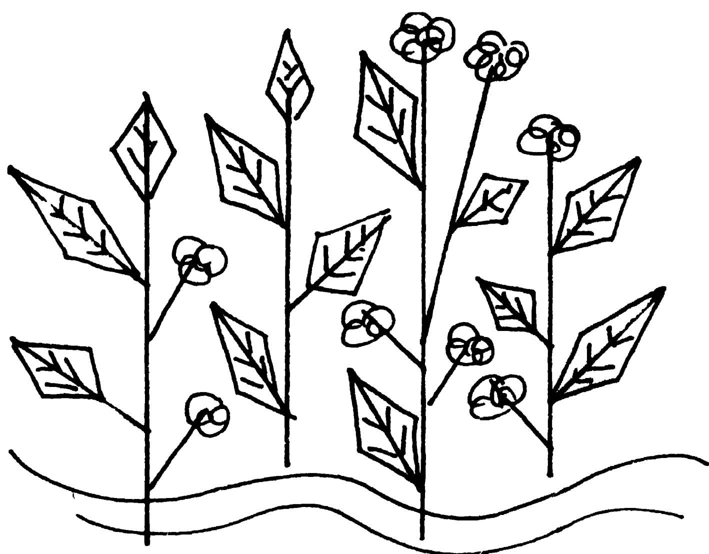
সুভাষ মুখোপাধ্যায়



সুভাষ মুখোপাধ্যায় অভিনব শুধু এই কারণে যে সমর সেনের পরে, এবং আরো প্রবল ও স্পষ্টভাবে, তিনি ব্যক্তিবাদের বিরোধী ; তাঁর মুক্তিকামনা একলার জন্য নয়, কোনো বিধাতানির্বাচিত মনীষীসম্প্রদায়ের জন্যও নয়, সমগ্র মনুষ্যসমাজেরই জন্য। সাম্য ও সংহতি ছাড়া মুক্তির অন্য-কোনো সংজ্ঞার্থ তাঁর মনে নেই ! ... সর্বনাশ যে আসন্ন—এমনকি উপস্থিত—এ-বিষয়ে সকলেই সচেতন ; আর এই সচেতনতার ফলে নৈরাশ্য ও বিদ্রূপই হয়েছে এ-যুগের কবিতার প্রধান দুটি সুর। কিন্তু এই সর্বনাশই যে নবীন সমাজকে প্রসব করবে, এই বিশ্বাস সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মনে এমনই জ্বলন্ত যে তিনি ব্যঙ্গনিপুণ হ'য়েও নৈরাশ্য থেকে মুক্ত, তাঁর কাব্যকে যা প্রাণ দিয়েছে তা আশার উল্লাস।

বুদ্ধদেব বসু

কবিতা ১৯৪০



ফুল ফুটুক না ফুটুক

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।

শান-বাঁধানো ফুটপাথে
পাথরে পা ডুবিয়ে
কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে
হাসছে।

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।

আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে
তার·

মৃত্যুর কোলে মানুষকে শুইয়ে দিয়ে
তারপর তুলে—
যে দিনগুলো রাস্তা দিয়ে চলে গেছে
যেন না ফেরে।

গায়ে-হলুদ-দেওয়া বিকেলে
একটা দুটো পয়সা পেলে
যে হরবোলা ছেলেটা
কোকিল ডাকতে ডাকতে যেত
— তাকে ডেকে নিয়ে গেছে দিনগুলো।

লাল কালিতে ছাপা
আকাশটাকে মাথায় নিয়ে
এ-গলির এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে
রেলিঙে বুক চেপে ধ'রে
এইসব সাতপাঁচ ভাবছিল—

ঠিক সেই সময়
চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল
আ মরণ। পোড়ারমুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি।

তারপর দড়াম ক'রে দরজা বন্ধ করার শব্দ

অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে
দাড়িপাকানো সেই গাছ
তখনও হাসছে ॥

দিগন্তে

পশ্চিমের আকাশে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে
যে কোনো দুর্ধর্ষ ডাকাতের মত
রাস্তার মানুষদের চোখ রাঙাতে রাঙাতে
নিজের ডেরায় ফিরে গেল

সূর্য।

তার অনেকক্ষণ পরে
সরকারের দপ্তরে
দিনকে রাত করতে
যে পুলিশের
কালো গাড়িতে এল

সন্ধ্যা।

আলোটা জ্বালতেই
জানলা দিয়ে বাইরে
লাফিয়ে পড়ল

অন্ধকার।

পর্দাটা সরাতেই
চকিত হরিণীর মত
আমাকে জড়িয়ে ধরল

হাওয়া॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



দুই পরস্পরবিরোধী সত্তার দুই প্রান্তের নিদর্শন মেলে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়—ক্রোধ, যুদ্ধ, উষ্মার পাশাপাশি স্নেহপ্রবণতা, মানবত্ব ও শান্তির কথা। ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনেও তিনি ঠিক এমনিই, যে হাতে হাতাহাতি বিরোধ সেই হাতেই বুকে জড়িয়ে ধরা বন্ধুত্ব। তাঁর কবিতার আপাত সারল্যের মধ্যে এমন এক গভীরতা রয়েছে, লঘুচালের আঙ্গিকে এমন এক অন্তরঙ্গতা যা একজন সৎ পাঠককে বহুদূরে নিয়ে যায়। প্রথম জীবনের প্রচণ্ড রোমাণ্টিক বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আজও রোমাণ্টিক, তবে জীবনের মধ্যপর্বের তীব্র তিক্তকষায় অভিজ্ঞতাগুলি তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক বিচিত্র শিল্পরূপ নিয়েছে।

কে জানে অদ্ভুত কতখানি

কে জানে অদ্ভুত কতখানি
উপচে পড়েছে পাত্রপাত্র থেকে ?

সারা রাত ঘুমুতে পারিনি
তবু স্বপ্ন দেখেছি, একটা ঘর, কিন্তু
এক হাত থেকে
অন্য হাতে তুফান খেলায় ভরে দিতে গেলে
অসীম শূন্যতা ।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রাধা, আমার রাধা

ভালবাসার দিনগুলিকে
ফিরিয়ে দেবে কোন নবাবু ?
তবু কি শ্মশানের মাঝিক
কিশোরীর অন্তরে শুকনো কাঠ !

'রাধা, আমার রাধা' বলে
কণ্ঠ চিরে যতই ডাকো,
কেউ দেবে না সাড়া । সবাই
হৃৎপিণ্ড ছুঁড়ে দিয়েছে ।

৪ ডিসেম্বর, ১৯৬৭

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা

ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে
যদি আমি সমস্ত জীবন ধ'রে
একটি বীজ মাটিতে পুঁততাম
একটি গাছ জন্মাতে পারতাম
যেই গাছ ফুল দেয়, ছায়া দেয়
যার ফুলে প্রজাপতি আসে, যার ফলে পাখিদের ক্ষুধা মেটে;
ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে
যদি আমি মাটিকে জানতাম।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অন্ধকার বুকের মধ্যে

তোদের দুখের ভালবাসায়
আমার মন ভরে না রে!
আমি তোদের বুকের মধ্যে ঘুমাতে চাই
দুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে নয়।
আমি তোদের বুকের মধ্যে জেগে উঠতে চাই
তোদের দুখের কথা শুনতে নয়।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তুমি পিপাসার জল দূর থেকে দ্যাখো
কাছে যাওয়া বিচার করুন;
সেখানে শিকারী বাঘ দিনদুপুরে ওৎ পেতে থাকে
পিতামহ দেখেছেন, শুনেছেন গ্রামের বৃদ্ধেরা।

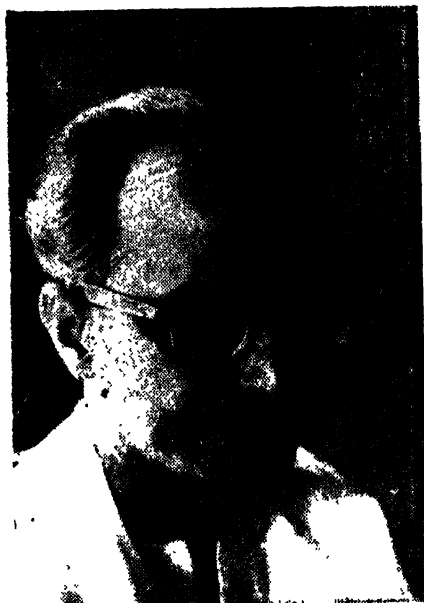
বুক ডুবে যেতে পারে এত পানি
তুমি অনুভব করো তার শীতলতা — তোমার দুপাশে বাজে
জাহাজের বাঁশি।
জাহাজ ভাসে না জলে, বিচার করুন ...

তোমার ধনুকে কোনো তীর নেই।

১৮ নভেম্বর, ১৯৮২

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়



দেড় যুগ আগের মঙ্গলাচরণ ছিলেন বাঙলা কবিতার ভরা আবেগের প্রতিনিধি। বেগার্ত অনুভব, ছিলাটান ছন্দ ও বর্ণাঢ্য শব্দ প্রয়োগের অবারিত দাক্ষিণ্যে তাঁর কবিতা ছিল সচ্ছল ও মুক্তবাধা। আমাদের কাছে একটা বয়সে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও মঙ্গলাচরণ ছিলেন তরুণ কবিতার অগ্নি। এখন একটি সত্য নির্দ্বিধ—কবি মঙ্গলাচরণ প্রবীণ হয়েছেন। এই প্রবীণতা দৃশ্যমান শাসিত আবেগে, ঘন-সন্নিবদ্ধ পয়ারের ব্যবহারে, ব্যক্তি-তন্ময়তা ও অন্তর্মুখীন চৈতন্য চর্চায়, সময়ের দ্বিধা ও সঙ্কটাপন্ন রূপের উন্মোচনে। মঙ্গলাচরণের এককালীন উচ্ছল, আত্মসমর্পিত কবিতার ললাটে চিবুকে এখন অনেক প্রশ্ন-চিহ্ন ও বলিরেখা জমেছে। মঙ্গলাচরণ অবশ্যই পূর্বের ন্যায় সামাজিক এবং মানুষের উত্তরণ ও বিজয়ে বিশ্বাসী। তবে সে বিশ্বাস অতিসরলীকরণে ও নিঃশর্ত সমর্পণে আর নিবেদিত নয়।



মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

আমি যেতে চাই, যাই

আমি যেতে চাই, যাব। পথে, পথের দু'পাশে জুড়ে সময়ের
খুচরো কারবারি হাঁকে, উজ্জ্বল দোকান দেয় বেলোয়ারি, যাই
আমি যেতে চাই, তবু আচমকা ঘড়ির পিছুডাক গুঁড়ো-গুঁড়ো
সময়-ভগ্নাংশ গুঁড়ো অনবরত ছড়ায় পায়ের নিচে, যাই
যেতে চাই আর ট্র্যাফিক-সিগন্যাল, রোখো, অফিস-ইস্কুল-ক্লাব
আড্ডা ও রেস্তোরাঁ, রোখো, 'কেমন ভালো তো?' 'ভালো',
'আছেন তো?' 'আছি' —
দেখি দূরে গেল বাস, কোচ ট্র্যাম, কান পেতে ট্রেনের হুইসল
যায়, যেতে চাই, যাই, পাই কি পাই না গতি ধমনী সংহতি
দূরে চৈতন্যের প্রত্যন্ত স্টেশন।

তবু যেতে হয়, যাই। মুহূর্তে-মুহূর্তে ছেঁড়ে চাওয়া, যাওয়া। যাই
কথার ঝলক, টুকরো নীরব, হঠাৎ কথা এ-পথে ধরাই
আকস্মিক ফুল তার ফেলে-যাওয়া জলবায়ু লীন পথরেখা
কেবল আমার যাওয়া পথে মনে মনপাথে মন থেকে পথে
আমার কেবল যাওয়া কথা ও ফুলের দিকে মনের মিছিলে
মুহূর্তের পাপড়ি খুলতে-খুলতে শতদল চাওয়া, যাওয়া, চাওয়া। যাই
দূর চৈতন্যের প্রত্যন্ত স্টেশনে।

আমার প্রত্যহ তুমি, সহচরী ঘর
খররৌদ্র কথা স্নেহ কলরব কথা
নিশ্বাস আয়াস তুমি আগলে আছ সমস্ত দরজা
দরজা — প্রস্থান নেই প্রবেশ নিষেধ।
তবু রৌদ্রে উপ্ত ছায়া ছায়ায় তলিয়ে স্তব্ধ
অন্তরঙ্গ অবকাশ
স্তব্ধ ও স্নেহের চোখে হঠাৎ হাত ও স্তব্ধ
সমস্ত শব্দের পর
অজস্র শব্দের পর
সমস্ত উপরিতল পালিয়ে তলিয়ে
সত্তার পাতাল — মূল
অন্ধকার গহন শিকড়
অন্ধকারে :
যেন-বা নিহিত ফল্গু
সমুদ্র অদৃশ্য ফল্গু
সমুদ্রের দিকে নদী — নদী নদী নদীই সমুদ্র ;
যেন মাতৃগর্ভে ভ্রূণ
জরায়ুজটিল বাঁধা
রক্তের ভেতরে তবু জননীর হৃদয়ে ছলাৎ ;
যেন মৃত্যু
ফিরে-ফিরে
অন্ধকার
মৃত্যুর সুরঙ্গ ফিরে
সহসা দুস্তর পলি স্বাদের শিকড়
আবার সবুজ স্রোত শিহরন শিখা
মাটি ও মানুষ — মন
খররৌদ্র কথা স্নেহ কলরব কথা
নিশ্বাস আয়াস তুমি খুলে রাখ ঘরে-ঘরে সমস্ত দরজা

আকাশ-কোলে দিগন্ত
পড়ছে যখন-তখন ঝিমাতে
ওই আবার আকাশ গুরু-মেঘেরই রণপায়ে
হুড়-দৌড়ে ইলশেগুঁড়ির ছিরছির ঝরনাতে
পাখির গানেই খুশি
ঢালছে মা জল বালতি-বালতি মেঘের কুয়োতলায়
সন্ধেসকাল গা-টা ধুয়ে কলসিতে জল ভরে
ফিরছে না সে এ-ঘরে ছাঁচতলায়।
বিবাগী — শুধু পালায়
ঘন কালোয় ভারি আকাশ ধরতে গেলেই পালায়।
#>
অন্ধকারের আকাশমাখা নদী —
দুলে মেঘের ঢেউ দে' ভালোবাসার বিজলি হেসে
বুকে ধাক্কায় বজ্র শোনায় যে
মাটির শিরা-উপশিরায় ধানের শিকড়-শিষে
দেয় ছড়িয়ে শীতল শীতল প্রাণ
শুধায় এ-রোজ বুকে শোনায় মেয়েমানুষ মোহ —
এমন-যে এক ঘরচাটা আর মাথাজালো নদী
নদী কথা বলে না
বালুর কাঁথামুড়ি ও ভর জ্বরে পুড়ছে গা
নদী মুখটি খোলে না।
#>
বছর-বছর কপাল ভাঙন, মনটা চেষ্টা-চেষ্টা করেই যারা
মাঠের ধানের শিল্পীর হাত আঁকতে শখের ফসলক্ষেতের সবুজ
দিচ্ছে প্রাণে এদিক-সেদিক হলুদবর্ন ছিটে
আকাশচাওয়া জীবনটাকে লাগছে কেমন বিশ্রী পাতাঝরা।
অনেকটা পথ ভাঙতে হবে, অনেক অনেক আরও —
আকাশ দৌড়ে কোনদিকে যায়, নদীর জলের কলসি কোথায়
খুঁজতে-খুঁজতে যেতে যেতে যেতে
তুলতে হবে বুকটা খুঁড়ে
বুকের শুকনো কুয়োর উধাও জলও।
#>
অনেক বলির রক্ত, মনের মানত চাইছে খরা।

এখন ভাঙন

কেবল ভাঙার শব্দ দিগ্‌বিদিকে। বিশ্বাসপ্রাকার পড়ছে। ভয়।
মস্ত একটা বনস্পতি টুকরো হয়ে, টুকরো-টুকরো হয়ে, মূলসুদ্ধ
উপড়ে, ছায়া ডাল পাতা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ভূলুণ্ঠমান। ধুলো উড়ছে
ধোঁয়া উঠছে, বোধবুদ্ধিহৃদয়মনীষা উপচে ভয় — ভয়ঙ্কর
ধুলো উড়ছে। না, আর আশ্রয় নয়। ছায়ার আঙুলে সেই ছোঁয়া।
আত্মহত্যাক্ষোভে ফুল মনের ড্রইংরুম রক্তিম প্লাস্টিকে
সাজায়, মাজায় সুর বেভুল অর্গ্যানে গান, বাজে বেলোয়ারি
প্রত্যেক মুহূর্ত প্রতি ভঙ্গুর মুহূর্ত — ভেঙে পড়তে-পড়তে প্রাণ
#>
প্রাণ তবু পথ ভাঙছে। বাড়ি পড়ছে। পার হচ্ছে ক্যাকটাস-কাঁটায়
ইঁটে ভগ্ন মূল্যবোধে নগ্ন মঠ, প্রত্যাশার চোরাবালি, পার
হয়ে যাচ্ছে বিধ্বস্ত স্নায়ুর দেশ রোমহর্ষধর্ষিত সময় —
না, আজ সময় নয়। এখন ভাঙন। ভাঙতে হচ্ছে পোড়ো বাড়ি
ঘুম ও দর্পণ, সুখ, ধারের আসবাব বুকের মারফতে দীর্ণ-
রক্তের অ্যাসফল্ট পাথে, ভাঙো ভাঙো, ভাঙতে হচ্ছে এখন ভাঙন।
#>
জন্মের আদিম দেনা শুধতে ফিরে যেতে হচ্ছে মাটি আর মানুষের দিকে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী



কবিতা লেখার আগেই কবির মনের মধ্যে পেঁাছে যায় একটা সুর—যা তাঁকে ঠেলে দেয় সমঞ্জস শব্দের নির্মাণে। বিষয় থেকে আঙ্গিক নয়, আঙ্গিক থেকেই বিষয়বস্তু—লেখার ব্যাপারটা এ রকম উলটো করে দেখেছিলেন এডগার এলান পো। পো-র সঙ্গে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অভিজ্ঞতাও মেলে। তাঁরও কবিতার ভাষা নিয়ন্ত্রণ করে ভাষা-পূর্ব একটা সুর—কখনো তা বিষাদ, কখনো প্রত্যাশা বা বিদ্রূপ। বিলুপ্ত নীলিমায় শিল্পীর ভূমিকা পালন করতে গিয়ে কবি প্রাত্যহিককেই সাংকেতিক করে তোলেন। দিন যাপনের কথা সরাসরি বলতে গিয়ে তিনি কোন শব্দ বা শব্দবন্ধ দুলিয়ে দেন সাংকেতিকতায়। বড় নিপুণ হাতে বাজান শব্দের সঙ্গীত—যা শুনতে শুনতে মনে হয় অন্ধকারই তাঁর কবিতার শেষ কথা নয়, তাঁর মনের গতি আলোর দিকে।



মিলিত মৃত্যু

বরং দ্বিমত হও, আস্থা রাখো দ্বিতীয় বিদ্যায়
বরং বিক্ষত হও তর্কের পাথরে।
বরং বুদ্ধির নখে শান দাও, প্রতিবাদ করো
অন্তত আর যা-ই করো, সমস্ত কথায়
অনায়াসে সম্মতি দিও না।
কেননা, সমস্ত কথা যারা অনায়াসে মেনে নেয়,
তারা আর কিছুই করে না,
তারা আত্মহননের পথ
পরিষ্কার করে।

#

একটি মৃত্যুর কথা বলা যাক।
যেহেতু এবং দুটি বাসনাকামনাকে এক হতে চেয়েছিল।

তবুও আঁচ নেই
এখন দুঃখ পারস্পরিক
দুঃখ এবং সুখ নিজেদের মধ্যে কোনো বিভেদ রাখেনি
তবুও আঁচ নেই।
চিন্তায় একান্নবর্তী হতে পারি সেটুকুই আঁচে না।
#
যে সব আপন বাঁশ আঁচে থাকা ভাল, এই জেনে
নিশ্চিত মৃত্যু থেকে আঁচে থাকা ভাল, এই জেনে —
তাহলে নিশ্চিত হও, অবশ্য রাখো দ্বিতীয় চিন্তায়
তাহলে বিস্মিত হও তক্তি পাথরে।
তাহলে শাণিত করো বুদ্ধির নখর।
প্রতিবাদ করো।
#
এই দৃশ্যে কোথাও অভিমানী সিঁদুর
অতীন্দ্রিয়কল্পনাভূমি যুবক-যুবতী হেঁটে যায়।
পশ্চাতের সব ইচ্ছায় সহজে ওরা দাঁড়িয়েছে সমস্ত
ওরা আর তাকাবে না ফিরে।
ওরা একমত হবে, ওরা একমত হবে, ওরা
একমত হতে-হতে কুসুমের সিঁড়ি
যেন উর্মি উঠে যায়, পায় দেহ স্বপ্নের শরীরে

কলকাতার চিত্র

লালবাতির পীড়াপীড়ি ছিল না,
তবুও রাস্তার জ্যাম বিখ্যাত কলকাতা শহর
হাতিটিকে বেঁধে রেখে;
ট্রামগুলোর উপর সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল
ট্যাক্সি ও প্রাইভেট, টাঙ্গা, অটোরিকশা ঠেলা-ঠেলার।
'গেল গেল' আর্তনাদে রাস্তার দু'দিক থেকে যত
ছুটে এসেছিল —
কাঁকুড়গাছি, শিয়ালদহ, দেশপ্রিয় ও গড়িয়ার —
এখন তারাও মন ছিঁড়ে চিত্রার্পিত মতো শিল্পীর ইজেলে
বন্দী হয়ে আছে।
স্তব্ধ হয়ে সবাই দেখছে,
চিত্রশালার ধারে
~~[illegible]~~
রাস্তার এক-ধার থেকে অন্য-ধারে হেঁটে চলে যায়
সবুজ উষ্ণীষ একটি শিশু।
#
আমি আগেই বৃদ্ধ হয়ে গেছি চৌরঙ্গীপাড়ায়
এখন রোদ্দুর যেন অতিথি বন্ধুর মতো
মেঘের হাতছানি ছুঁয়ে
নেমে আসছে;
সারাদিন আলোয় ভাসছে কলকাতা শহর

#

স্টেটবাসের জানালায় মুখ রেখে
একবার আকাশ দেখি, একবার তোমাকে
ভিখারী মায়ের শিশু,
কলকাতার যিশু,
সমস্ত ট্রাফিক তুমি মন্ত্রবলে থামিয়ে দিয়েছ
জনতার আর্তনাদ, অসহিষ্ণু ড্রাইভারের দাঁতের ঘষটানি,
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই;
দু-দিকে উদ্যত মৃত্যু, তুমি তার মাঝখান দিয়ে
টলতে টলতে হেঁটে যাও।
যেন মূর্ত মানবতা, সদ্য হাঁটতে শেখার আনন্দে
সমগ্র বিশ্বকে তুমি পেতে চাও
হাতের মুঠোয়। যেন তাই
টলোমলো পায়ে তুমি
পৃথিবীর এক-কিনার থেকে অন্য-কিনারে চলেছ।

—

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী